Tuesday, November 12, 2024

সর্বজনকথা

আনু মুহাম্মদ সম্পাদিত রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ বিশ্লেষণমূলক সংকলন

সর্বজনকথা

১১তম বর্ষ, ১ম সংখ্যা

জুলাই গণঅভ্যুত্থানে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক নেটওয়ার্ক

১৬ জুলাই থেকে ১০ আগস্ট ২০২৪

সংকলন ও ভূমিকা: সামিনা লুৎফা নিত্রা

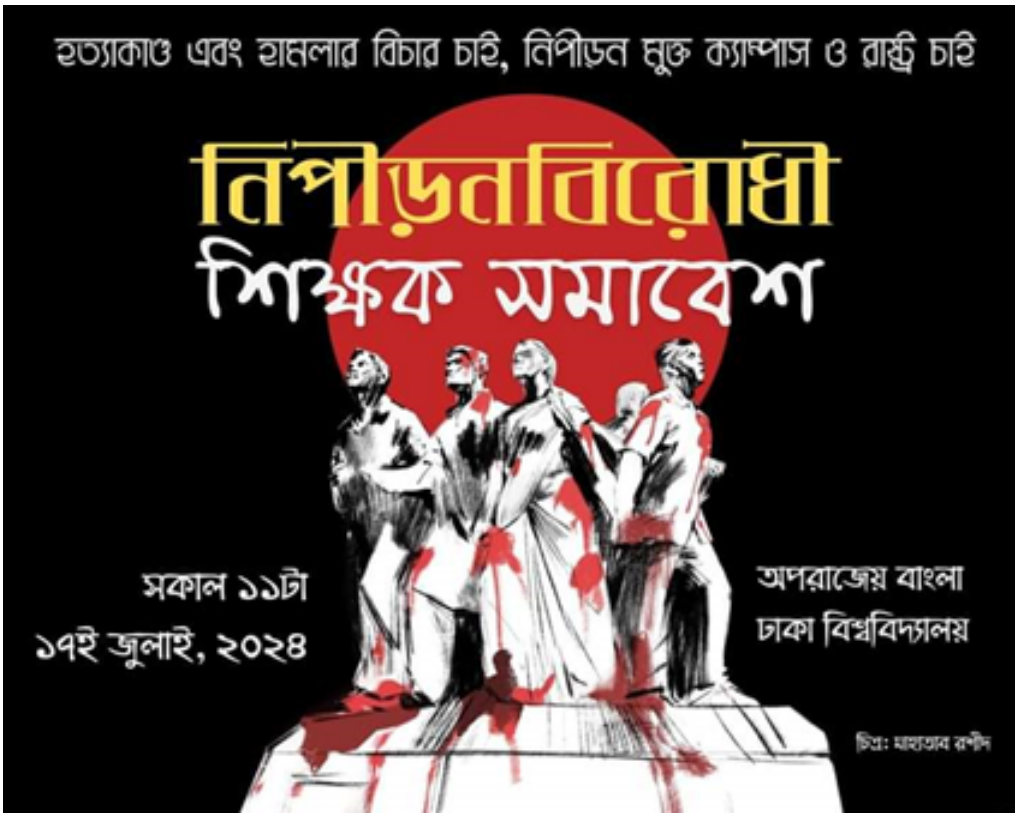

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক নেটওয়ার্ক (বিশিনেট), পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মঞ্চ, জুলাইয়ের শুরু থেকেই আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করছিল যদিও তখনই শিক্ষার্থীদের আন্দোলনে সরাসরি যুক্ত হয়নি। ২০১৮ সালের অভিজ্ঞতা থেকেই নেটওয়ার্কের বেশির ভাগ সদস্য মনে করেন যে যখন শিক্ষার্থীরা নিপীড়িত হয়েছিলেন তখন তাদের পাশে আমরা ছিলাম, পরে আন্দোলনের জেরে পুরো কোটা পদ্ধতি বাতিল হয়ে যাওয়া ভুল ও অযৌক্তিক ছিল। এবার এমন কিছু হতে পারে এমন আশংকা থেকেই প্রাথমিক ভাবে আমরা যুক্ত হইনি। তবে পরবর্তীতে যখন ১৫ তারিখ থেকে এই আন্দোলনের উপর ছাত্রলীগ-যুবলীগ এবং অন্যান্য লীগের হামলা শুরু হলো, পরবর্তীতে পুলিশ যুক্ত হয়ে আবু সাঈদসহ ছয় জনকে হত্যা করলো তারপর আমাদের পক্ষে আর চুপ করে বসে থাকাটা সম্ভব হচ্ছিল না। ১৬ তারিখ বিকালেই আমরা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক নেটওয়ার্কের কয়েকজন সদস্য ক্যাম্পাসে জড়ো হয়ে আহত শিক্ষার্থীদের দেখতে ঢাকা মেডিকেলে যাই এবং সেখানে গুলিবিদ্ধ শিক্ষার্থীদের চিকিৎসার খোঁজখবর করে বাসায় ফিরি। সে রাতেই নেটওয়ার্কের জুম সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পরদিন সকালে 'নিপীড়নবিরোধী শিক্ষক সমাবেশ' ডাকা হয় অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে।

১৭ জুলাই ছিল আশুরা এবং সব দোকান বন্ধ। আমাদের ব্যানার লেখা হয়নি, মাইক্রোফোনের রিকশা পুলিশী বাধায় আটকে যায়, আরও অনেক বাধা ছিল। সেসব পেরিয়ে অনেকে পৌঁছান সমাবেশ স্থলে। আরেক সংগঠন থেকে নিয়ে হ্যান্ডমাইকের ব্যবস্থা হলেও তারাও আটকা পড়ে পুলিশের কাছে। ওই দিন সকাল থেকেই ওই এলাকায় কোনো মোবাইল নেটওয়ার্ক কাজ করছিল না, ফোন সংযোগও পাওয়া যাচ্ছিল না। ইন্টারনেট কানেকশন বারবার ওঠানামা করছিল। এরকম একটা পরিস্থিতিতে আমরা ওই সমাবেশ করি। ওইদিন আসলে নিপীড়ন বিরোধী শিক্ষক সমাবেশে বিশিনেট ছাড়াও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্য শিক্ষকরাও উপস্থিত ছিলেন। পরবর্তীতে আমরা মিছিল করে শাহবাগে যাই এবং থানায় আটক দু'জনকে নিয়ে অপরাজেয় বাংলায় এসে সমাবেশ করি। এর পরের দিন আমরা একটা বিবৃতি দিই, বিবৃতিতে যে সাতটি দাবি ছিল তার প্রথম চারটি আর বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নয় দফা দাবির প্রথম চারটি ছিল অভিন্ন। ১৮ তারিখে বিবৃতিটি যাওয়ার কয়েক ঘন্টার মধ্যেই ইন্টারনেট ডাউন হয়ে যায়, তখনও বোধহয় ভিপিএন দিয়ে চালানো যাচ্ছিল, কিছুক্ষণের মধ্যেই একেবারে ইন্টারনেট ব্ল্যাক আউট হয়ে যায়।

ইন্টারনেট চলে যাবার পর আমরা ফোনে যোগাযোগ করে একটি ইমেইল লিখি যা জাতিসংঘের কাছে, মূলত UNHRC আর IHRO এর কাছে পাঠানো হয়। ২৭ তারিখে আমরা আটককৃত সমন্বয়কদের খুঁজতে ডিবি অফিসে হাজির হই। যা সে সময় মানুষের মনে সাহস জোগাতে বিশেষ ভূমিকা রেখেছিল বলে জানতে পারি! এরপর নাগরিক সমাজ আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষক নেটওয়ার্ক যোগ দেয় এবং এর মধ্যে নেটওয়ার্কের দুই সদস্যের বিরুদ্ধে থানায় জিডি করেন একজন শিক্ষক। তার বিরুদ্ধে বিবৃতি দেওয়া হয় এবং একটি সমাবেশ করা হয় যেখান থেকে ছাত্র হত্যাকারীদের বিচার চাওয়া হয়। ২৯ জুলাই এর এই সমাবেশের পর ১ আগস্ট আমাদের আরেকটি সমাবেশ হয়। এ সমাবেশে শিক্ষক-শিক্ষার্থী-জনতার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস খুলে দেবার দাবি ওঠে। আমরা শিক্ষার্থী-শিক্ষক-জনতার মিছিল নিয়ে রাজু প্রদক্ষিণ করে শহীদ মিনারে যাই শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে।

এর পরদিন, অর্থাৎ ২ আগস্ট প্রতিবাদী শিক্ষার্থী-জনতার দ্রোহযাত্রার আয়োজকদের অন্যতম ছিল বিশিনেট। দ্রোহযাত্রার মূল শক্তি ছিল শিক্ষার্থীরা সাথে সাংস্কৃতিক কর্মীরা এবং শিক্ষক নেটওয়ার্ক। প্রেসক্লাবে বিশাল জনসমুদ্রের সামনে বিশিনেট সদস্য অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ শেখ হাসিনার পদত্যাগের একদফা দাবী উত্থাপন করেন। ৪ আগস্ট ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক নেটওয়ার্কের সংবাদ সম্মেলনে হাসিনা সরকারের পদত্যাগের পর অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের কাছে

ক্ষমতা হস্তান্তরের রূপরেখা দেয়া হয়। এই রূপরেখা পরবর্তীতে সমন্বয়কদেরকেও পৌঁছানো হয় এবং পরদিন ৫ আগস্ট স্বৈরাচারের পতন ঘটে। সেদিনও বিশিনেট-এর সদস্যরা রাস্তায় ছিলেন।

নীচে এসব তৎপরতার কয়েকটি দলিল সংযুক্ত করা হলো।

› জুলাই

শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে হত্যাকাণ্ড, হামলা ও নির্যাতনের সাথে জড়িতদের শাস্তি দিতে হবে

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক নেটওয়ার্কের বিবৃতি

কোটা-সংস্কারের শান্তিপূর্ণ শিক্ষার্থী আন্দোলনের ওপর গুলি চালিয়ে আবারও রক্তাক্ত করা হলো বাংলাদেশকে। মিডিয়ার খবরে জানা যাচ্ছে, দেশের বিভিন্ন জেলায় ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পুলিশের গুলিতে নিহত হয়েছেন ৫ জন শিক্ষার্থী আন্দোলনকারী। দেশব্যাপী আহত হয়েছেন হাজারখানেক শিক্ষার্থী। গত ১৫ জুলাই দিনভর ও ১৬ জুলাই প্রথম প্রহরে ছাত্রলীগ নামধারী গুণ্ডা ও বহিরাগত সন্ত্রাসীদের নামিয়ে দিয়ে শিক্ষার্থীদের ওপর নারকীয়, ভয়াবহ এবং মর্মান্তিক হামলা চালানো হয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের বিভিন্ন ক্যাম্পাসে। এরপর ১৬ জুলাই দিনভর পুলিশ ও ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীদের হামলা চলেছে দেশব্যাপী এবং সেই হামলা আগের দিনের তীব্রতাকে হার মানিয়ে হত্যাকাণ্ডের মতো ক্ষমার অযোগ্য ঘটনার জন্ম দিয়েছে। এসব ন্যাক্কারজনক হামলার মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর স্বায়ত্তশাসনকে যেভাবে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখানো হয়েছে, তা আমাদেরকে গভীরভাবে উদ্বিগ্ন করে তুলেছে। আমরা গভীর উদ্বেগ ও বেদনার সঙ্গে এসব হত্যাকাণ্ড ও হামলার নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাই এবং নিহতদের শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাই। একইসঙ্গে, এসব হত্যাকাণ্ড ও হামলার বিচার বিভাগীয় তদন্ত করে দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানাই।

এছাড়া, সন্ত্রাসীদের হামলায় জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের বাঁচাতে গিয়ে কর্মরত কয়েকজন শিক্ষকও আহত হয়েছেন। অথচ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর প্রশাসকেরা নীরবে এই সব ন্যাক্কারজনক হামলা এবং নিজ শিক্ষার্থীদের রক্তপাতকে বৈধতা দিয়েছেন এবং এই শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে রক্তপাতের অংশীদার হয়েছেন শুধুই পদপদবি আঁকড়ে রাখার জন্য। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের এসব লজ্জাহীন প্রশাসকদের আমরা ধিক্কার জানাই।

আমরা মনে করি, ২০১৮ সালে শিক্ষার্থীদের দাবি কোটা শতকরা ৫৬ ভাগ থেকে কমিয়ে আনার যৌক্তিকতা ছিল। এই ন্যায্য ও যৌক্তিক আন্দোলন থেকে উত্থাপিত দাবি বিবেচনা না করে সরকার পরিকল্পিতভাবেই প্রথমত উপেক্ষা ও দ্বিতীয়ত দমন ও নিপীড়নের নীতি গ্রহণ করেছিল । অবশেষে আন্দোলন তীব্র হলে, প্রধানমন্ত্রী ‘বিরক্ত হয়ে’ কোটা প্রথা পুরোপুরি বাতিল করে দেন। আমরা মনে করি, সেটা একটা বিভ্রান্তিকর এবং চাতুর্যপূর্ণ সিদ্ধান্ত ছিল। কারণ নারী এবং অনগ্রসর জনগোষ্ঠীকে মূলধারায় আনার জন্য কোটার প্রয়োজন রয়েছে, কিন্তু তা চলমান বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে যৌক্তিকভাবে সংস্কার করা প্রয়োজন ছিল।

সরকারের কোটা বাতিলের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে করা একটি রিটের শুনানিতে হাইকোর্ট ‘সংবিধান পরিপন্থী’ বিবেচনা করে ২০১৮ সালের পরিপত্রকে বাতিল করার রায় দিয়েছেন। অর্থাৎ ৫৬% কোটার পরিস্থিতি আবার ফিরে আসে এবং চাকরিপ্রার্থী ও

শিক্ষার্থীরা আবারও আন্দোলনে নামেন। এদিকে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ হাইকোর্টের রায়ের ওপর চার সপ্তাহের জন্য স্থিতাবস্থা জারি করেন। অর্থাৎ আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা রাজপথ না ছেড়ে শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোলন চালিয়ে গেলেও, আগস্ট মাসে কোটাব্যবস্থার সংস্কারসহ যুক্তিযুক্ত সুরাহা হবার পথ তৈরি হয়েছিল, যা পরিহার করে সরকার যথারীতি শিক্ষার্থীদের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ বানিয়ে নির্যাতন আর নিপীড়নকেই বেছে নিল।

মরা বিশ্বাস করি, মুক্তিযোদ্ধাদের ত্যাগ ও সংগ্রাম ছাড়া আমরা একটি স্বাধীন দেশ পেতাম না। তাদের এবং তাদের পরের প্রজন্মের জন্য কোটা সে সময়ের জন্য সঠিক ছিল। কিন্তু তৃতীয় প্রজন্মের জন্যও ওই কোটা একইভাবে রাখার প্রয়োজন ই বিধায় এটি কমিয়ে আনা দরকার। এই বিষয়টিকেই সরকার ২০১৮ সালে এবং এ বছরও রাজনৈতিক স্পর্শকাতরতায় রূপ দিয়েছে এবং আন্দোলনকারীদের 'রাজাকার-সংশ্লিষ্ট' বা মুক্তিযুদ্ধবিরোধী তকমা দেবার চেষ্টা করেছে। ২০১৮ সালেও ংকালীন কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী সংসদে দাঁড়িয়ে আন্দোলনকারীদের 'রাজাকারের বাচ্চা' বলে কালিমালিপ্ত করার চেষ্টা করেছিলেন। এবারও প্রধানমন্ত্রী তাঁর গত ১৪ জুলাইয়ের সংবাদ সম্মেলনে মুক্তিযোদ্ধাদের তৃতীয় প্রজন্ম বা নাতিপুতির পরীতে, পরোক্ষভাবে, আন্দোলনকারীদেরই 'রাজাকারের নাতিপুতি' বলেন। প্রধানমন্ত্রীর ওই বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে রাতেই াকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাস থেকে বেরিয়ে আন্দোলনকারীরা "তুমি কে আমি কে/ রাজাকার রাজাকার/ কে বলেছে কে লছে/ স্বৈরাচার স্বৈরাচার"- স্লোগানসহ রাস্তায় নেমে আসে। দুর্ভাগ্যবশত এই স্লোগানকে ভুলভাবে ব্যাখ্যা করে আন্দোলন ানের জন্য সরকার উগ্র দলীয় কর্মীদের উস্কে দেয়ার সুযোগ হিসেবে ব্যবহার করল।

২০১৪, ২০১৮ ও ২০২৪ সালের বিতর্কিত ও অগ্রহণযোগ্য নির্বাচনে জনগণের ম্যান্ডেট ছাড়াই ক্ষমতায় বসে থাকা সরকার যেকোনো অধিকার সংক্রান্ত আন্দোলনকে সন্দেহের চোখে দেখে, এবং ব্যাপক নিপীড়নের মধ্য দিয়ে তা সরকারবিরোধী জনবিক্ষোভে পরিণত হবার সম্ভাবনাকে অঙ্কুরে নষ্ট করে দিতে চায়। দেশে ভয়াবহ লুণ্ঠন, সম্পদ পাচার, দুর্নীতি না থামিয়ে এদের বাড়তে দেয়া হয় কারণ এই লুণ্ঠনজীবীরাই সরকারের একচ্ছত্র ক্ষমতার পাহারাদার। অন্যদিকে দেশের রিজার্ভের ভয়াবহ অবনতি ও তা ঘোচাতে চীনের কাছ থেকে আশানুরূপ সাড়া না পাওয়া এবং ভারতের রেল যোগাযোগ নিশ্চিত করতে গিয়ে দেশের স্বার্থ জলাঞ্জলি দেওয়া বা ভারত তিস্তার ব্যারাজ খুলে দিয়ে পুরো উত্তরবঙ্গ প্লাবিত করার এই দুঃসময়ে দেশের শিক্ষিত যুবসমাজকে আন্দোলন এবং দমন-পীড়ন দিয়ে ব্যস্ত রাখাও তাদের কৌশলের অংশ। আমরা ইস্যু দিয়ে ইস্যু ঢাকার এরকম রাষ্ট্রীয় ও সরকারি অপতৎপরতার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাই।

আমাদের দাবি

১। শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে যারা হামলা করেছে, গুলি করেছে, হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে তাদের শনাক্ত করে শাস্তির আওতায় নিয়ে আসতে হবে।

২। শিক্ষার্থীদের ন্যায্য দাবি অনুযায়ী সরকারি চাকরিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে কোটার যৌক্তিক সংস্কার করতে হবে। সংবিধানের আলোকে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করে কোটা সংস্কারের রূপ নির্ধারণ করতে হবে।

৩। ছাত্রলীগ নামধারী বহিরাগত সন্ত্রাসীদের ক্যাম্পাসে অনুপ্রবেশ ও ত্রাস সৃষ্টির ঘটনার প্রতি আমরা তীব্র নিন্দা জানাই এবং আর কোনো বহিরাগত যেন ক্যাম্পাসে ঢুকতে না পারে সে ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও পুলিশ প্রশাসনকে পদক্ষেপ নিতে

হবে।

৪। শিক্ষার্থীরা যাতে নিরাপদে ছাত্রাবাসে থাকতে পারে সেজন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

। জুলাই

হত্যাকাণ্ড এবং হামলার বিচার ও নিপীড়নমুক্ত ক্যাম্পাস ও রাষ্ট্রের দাবিতে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক নেটওয়ার্ক একটি সমাবেশ কে। সমাবেশের শিরোনাম হয় 'নিপীড়নবিরোধী শিক্ষক সমাবেশ'। এ সমাবেশের জন্য বাইরে থেকে ক্যাম্পাসের ভেতরে কেউ ঢুকতে পারবেন কিনা এ নিয়ে আমাদের সংশয় ছিল। আমরা যারা ক্যাম্পাসের বাইরে থাকি তারা নানান কৌশল বলম্বন করে ক্যাম্পাসে ঢুকেছিলাম। সেদিন ক্যাম্পাসের ভেতরে ইন্টারনেট ছিল না বলে কয়েকবার চেষ্টা করেও ছবি বা ভিডিও নেটওয়ার্কের পেইজে দেওয়া যায় নাই। তবে এদিন আমরা একটা হাতে লেখা ব্যানার নিয়ে মিছিল করে শাহবাগ থানা কে আটককৃত শিক্ষার্থীদের মুক্ত করে এনেছিলাম। সমাবেশের পর আমরা নেটওয়ার্কের পক্ষ থেকে ভিসির বাসভবনে যাই শিক্ষার্থীদের ক্যাম্পাস ত্যাগে জোর না করার অনুরোধ নিয়ে। ভিসি আমাদের সাথে দেখা করেন নি এবং প্রকটরিয়াল টিমকে মাদের আশঙ্কা জানিয়ে আমরা ফিরে আসি। আমাদের আশংকা সত্য হয়, সেদিন সন্ধ্যায় সাউন্ড গ্রেনেড, টিয়ার শেল নিয়ে আক্রমণ করে পুলিশ, র‍্যাব, বিজিবি এবং ছাত্রলীগের গুন্ডাবাহিনী হল থেকে মেরে শিক্ষার্থীদের বের করে দেয়।

১৮ জুলাই

ভয় ও সন্ত্রাসমুক্ত সচল একাডেমিক ক্যাম্পাস চাই

প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক নেটওয়ার্কের প্রতিবাদ

(ইন্টারনেট বন্ধ হয়ে যাবার কয়েক ঘন্টা আগে এই বিবৃতি সংবাদ মাধ্যমে পাঠানো হয়।)

চলমান কোটা সংস্কার আন্দোলন ঘিরে বিগত কয়েকদিন যা ঘটেছে তাতে সাধারণ নাগরিক থেকে শুরু করে শিক্ষকরা সকলেই বেদনাহত। দেশব্যাপী ছড়িয়ে পড়া এই আন্দোলন নানা সংঘাতময় পরিস্থিতি পেরিয়ে, ৭ জনের মৃত্যু ও হাজারো তরুণের আহত হওয়ার মধ্যে দিয়ে আমাদের কাছে স্পষ্ট করেছে রাষ্ট্রীয় ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের বিতর্কিত, একপেশে এবং দায়িত্বজ্ঞানহীন ভূমিকা, যা দেখে আমরা বিক্ষুব্ধ।

দেশ যখন চরম এক সঙ্কটময় পরিস্থিতিতে তখন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত বুধবার (১৭ জুলাই) জাতির উদ্দেশে প্রায় আট মিনিটের এক ভাষণ দেন। তার বক্তব্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, তিনি তরুণ সমাজের স্বপ্নীল ভবিষ্যৎ ও পেশাগত সুযোগের দাবির বিষয়টি আজও অন্তরে ধারণ করেন নি, তার বিচারে বরং সেসব 'কোমলমতি' তরুণরা 'কিছু বিশেষ মহল' দ্বারা বিভ্রান্ত। সেই বিশেষ মহলকে তিনি সংজ্ঞায়িত করেননি, কিন্তু তাদের 'সন্ত্রাসী কার্যক্রমের' যে উদাহরণ তিনি দিলেন, তার শিকার হিসেবে নিজের দলের ছাত্রের কথাই কেবল উল্লেখ করেন। যেকোনো তরুণ প্রাণের, তার ভাষায়, 'অহেতুক মৃত্যু'ই বেদনাদায়ক ও নিন্দনীয়। কিন্তু তার এই পক্ষপাতে বোঝা যায় তিনি সব নাগরিকের সরকার প্রধান নন, কেবল তার নিজের

লোকের জন্যই তার ভাবনা ও কার্যক্রম আবর্তিত। চট্টগ্রামের ছাত্রলীগের সদস্যের মৃত্যুর পূর্বে যে পুলিশ বাহিনী ও ছাত্রলীগের যৌথ তৎপরতায় ৪জন আন্দোলনকারীর মৃত্যু হয়েছে, তা উল্লেখ করার প্রয়োজন তিনি বোধ করেন নি। এমনকি যে সন্ত্রাসী কার্যক্রমের কথা তিনি বারবার উল্লেখ করেছেন, তা যেন কেবল আন্দোলনকারী এবং কিছু মহলের একলার ব্যাপার ছিল। তার অনুগত ছাত্রলীগের সদস্য ও বহিরাগত ভাড়াটেরাই যে ১৫ জুলাই প্রথম আন্দোলনকারীদের ওপরে চড়াও হয়ে ব্যাপকভাবে সন্ত্রাসের জন্ম দেয়, তার ভাষণে সেসবের কোনো উল্লেখ ছিল না। তিনি জানান, বিচারবিভাগীয় তদন্তের মাধ্যমে বের করা হবে

রা ছিল উস্কানিদাতা ও অরাজক পরিস্থিতি তৈরীর জন্য কারা দায়ী ছিল। তাদের বের করে যে শাস্তি দেয়া হবে, তাও তিনি উল্লেখ করেন। কিন্তু তার উদাহরণ বাছাই দেখে সন্দেহ করার কারণ রয়েছে যে, এই তদন্ত ও শাস্তি প্রক্রিয়ায় হত্যাকারী পুলিশ

সন্ত্রাস কায়েমকারী ছাত্রলীগের সদস্যদের রেহাই দেয়া হবে, এবং আন্দোলকারীদেরই বেছে বেছে শাস্তি দেয়া হবে। ইতোমধ্যে পুলিশ, বিজিবি এবং র‍্যাব দিয়ে শিক্ষার্থীদের ক্যাম্পাস থেকে বের করে দেয়া হয়েছে। ক্যাম্পাসে ক্যাম্পাসে

ত্রলীগের দখল থেকে হলগুলো মুক্ত হবার পরের দিনই এই পদক্ষেপ আমাদের শঙ্কিত করে যে ছাত্রলীগের পশ্চাদপসরনের ফলে এখন সরকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর নিয়ন্ত্রণ সরাসরি নিতে চায়। আমরা সামনের দিনগুলোয় ঘনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণ

রবো, যে ক্যাম্পাসগুলো ছাত্রলীগের কারণে সাধারণ শিক্ষার্থীদের কাছে পুনরায় এক সন্ত্রস্ত জনপদ হয়ে ওঠে কিনা।

র যে কথাটি বলতেই হয়, অহেতুক প্রাণ ঝরে যাওয়া এবং অরাজক পরিস্থিতি তৈরী হবার পেছনে খোদ প্রধানমন্ত্রীর যে দায় ..ছে, তার বক্তৃতায় স্বীকার করার সৎসাহস তিনি দেখান নি। ২০১৮ সালে কোটা সংস্কার আন্দোলনের এক পর্যায়ে আচমকা তিনি সংসদে দাঁড়িয়ে কোটা প্রথা বিলোপ করার ঘোষণা দেন। অথচ আন্দোলনকারীরা কোটা প্রথার বিলোপ চান নি, চেয়েছেন সংস্কার। তার সেই সিদ্ধান্তের কারণেই কিছু নাগরিক সেই সংক্রান্ত পরিপত্র বাতিলের দাবি জানিয়ে পরে রিট করেছে এবং হাইকোর্ট ওই পরিপত্রটি সংবিধানের কিছু ধারার পরিপন্থী হওয়ায় গত জুন মাসে তা অবৈধ ঘোষণা করে। কারণ সংবিধানে অনগ্রসর নাগরিকদের নানা সুবিধা দেবার কথা আছে। ২০১৮ সালেই যদি তিনি সংস্কারের ব্যবস্থা নিতেন তবে আজ এই পরিস্থিতি হতো না। তিনি ১৪ই জুলাইয়ের সংবাদ সম্মেলনে জানান, ‘বিরক্ত হয়ে’ তিনি কোটা প্রথা বাতিল করেছিলেন। বস্তুত তিনি কোনো জনদাবিই সহজে মানতে চান না, সব দাবি ও আন্দোলনের ভেতরেই তিনি ‘কিছু মহলের’ উস্কানি ও অংশগ্রহণ দেখেন। দূরদর্শিতা ও বিচক্ষণতা বাদ দিয়ে বিরক্তি ও জেদের বশবর্তী হয়ে রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলে তা কখনোই জনগণের জন্য মঙ্গলজনক হয় না। সেই সংবাদ সম্মেলনে তিনি এমনকি আন্দোলনকারীদের পরোক্ষভাবে ‘রাজাকারের নাতিপুতি’ বলে কটাক্ষ ও তাচ্ছিল্য করেন এবং একারণে সেই রাতেই শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া শিক্ষার্থীরা বিক্ষুব্ধ হয়ে রাস্তায় নেমে আসে। তার নিজের এই দুই দায় এড়িয়ে বক্তৃতাজুড়ে তিনি আন্দোলনের পেছনের ষড়যন্ত্র খুঁজে গেলেন।

প্রধানমন্ত্রীর সংবাদ সম্মেলনের পর, গত পাঁচদিনে, আন্দোলনকারীদের ফুঁসে ওঠা, আন্দোলনকারীদের ওপর ছাত্রলীগের নির্মম হামলা, শিক্ষার্থীদের ঐক্যবদ্ধ হওয়া ও ক্যাম্পাস থেকে ছাত্রলীগকে বিতাড়ন, পরদিনই আবার পুলিশ দিয়ে ক্যাম্পাসগুলো থেকে শিক্ষার্থীদের বের করে দেয়া – এই ঘটনাগুলো একের পর এক দ্রুত ঘটতে থাকে এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অবৈধ বলপ্রয়োগ করা হয়। এই পুরো প্রক্রিয়ায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের ভূমিকা অত্যন্ত লজ্জাজনক ও নিন্দনীয়। শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে তাদেরকে দেখা যায় নি, বলা যায় কোনো ধরনের কার্যক্রমেই তারা হাজির ছিলেন না। তাদের একমাত্র কাজ ছিল বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের অবৈধ নির্দেশক্রমে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধের ঘোষণা দেয়া এবং বিজিবি ও পুলিশবাহিনীকে ক্যাম্পাসে অবাধে প্রবেশ করতে দেয়া। এমনকি কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে রাতে কয়েক ঘণ্টা ধরে

বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ ও ইন্টারনেটের গতি কমানো হয়। শিক্ষার্থীদের ছাত্রাবাস ত্যাগ করার জন্য মাত্র কয়েক ঘণ্টা সময় দেয়া হয় এবং অবরুদ্ধ পরিবেশে পরিবহণ সেবা দেয়া কিংবা ধাপে ধাপে হল খালি করার মতো ধৈর্য্য ধারণ করতে রাজী ছিলেন না প্রশাসকরা। এরকম দায়িত্বহীন প্রশাসকদের শীর্ষে আছেন ঢাকা, জাহাঙ্গীরনগর, ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন। তাদের কেউ বলছেন ক্যাম্পাস তাঁর নিয়ন্ত্রণে নেই, কেউ মাথা নীচু করে অভিযোগ শুনছেন, কাউকে প্রয়োজনের সময় পাওয়া যাচ্ছে না, অথচ পুলিশকে নির্দেশ দিচ্ছেন আক্রমনের। এ বড় লজ্জার দিন বাংলাদেশের ইতিহাসে।

এক্ষেত্রে শিক্ষক নেটওয়ার্কের কয়েকজন শিক্ষক এবং অন্যান্য নাগরিক এগিয়ে আসেন, অবরুদ্ধ ও অপ্রস্তুত শিক্ষার্থীদের নিজ নিজ বাসায় স্বল্পকালীন থাকার সুযোগ করে দেন। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিরা আবারো প্রমাণ দিলেন যে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের স্বার্থরক্ষার চাইতে তারা সরকারের আজ্ঞাবহ থাকতে চান এবং যাদের স্বায়ত্তশাসনের অধিকার আছে, তারা সেই অধিকার প্রয়োগ করতে চান না। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, প্রভোস্টসহ প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত শিক্ষকদের এই মতজানু ও জনবিরুদ্ধ অবস্থান দেখে আমরা ভয়ঙ্করভাবে ক্ষুব্ধ এবং শিক্ষকসমাজের অংশ হিসেবে শিক্ষার্থীদের কাছে আত্মকভাবে লজ্জিত। বছর বছর, লাগাতার শিক্ষার্থীবিরুদ্ধ ভূমিকা সত্ত্বেও তারা ক্লাসে শিক্ষার্থীদের সামনে যাবার মতো নির্লজ্জ ও বেহায়া প্রজাতিতে পরিণত হয়েছেন।

াকার ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের কাছে আমাদের দাবি:

১। প্রধানমন্ত্রী তার অপরিণামদর্শী পদক্ষেপের জন্য শিক্ষার্থীসমাজের কাছে দুঃখপ্রকাশ করবেন।

২। যেসব বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসকেরা শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা না দিয়ে তাদের হামলার মুখে ছেড়ে দেবার মতো দায়িত্বহীনতার পরিচয় দিয়েছেন যেমন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এবং শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যসহ প্রক্টোরিয়াল বডি পদত্যাগ করবেন।

৩। নিহত শিক্ষার্থীদের পরিবারকে আর্থিক সহায়তা দিতে হবে এবং আহতদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে।

৪। হত্যাকারী এবং হামলাকারীদের চিহ্নিত করতে হবে এবং শাস্তি দিতে হবে। আটক/ গ্রেফতার শিক্ষার্থীদের মুক্তি দিতে হবে। সব শিক্ষার্থীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।

৫। অবিলম্বে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো খুলে দিতে হবে এবং ছাত্রলীগের হাত থেকে ছাত্রাবাস উদ্ধার করে পুরোপুরি শিক্ষকদের ব্যবস্থাপনায় ছেড়ে দিতে হবে। মেধার ভিত্তিতে ছাত্রাবাসের আসন বণ্টন করতে হবে। হলগুলো ছাত্রলীগের দখলমুক্ত রাখতে হবে।

৬। অবিলম্বে সরকারি চাকরিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে কোটার যৌক্তিক সংস্কার করতে হবে। সংবিধানের আলোকে একটি কমিটি গঠন করে কোটা সংস্কারের রূপ নির্ধারণ করতে হবে। কমিটিতে শিক্ষার্থীদের প্রতিনিধিত্ব থাকতে হবে।

২২ জুলাই ২০২৪

জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশন এবং আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থাসহ যুক্তরাজ্য ও অস্ট্রেলিয়ার সাংসদদের কাছে মাঠের তথ্য ইমেইলে প্রেরণ করেন তিন নেটওয়ার্ক সদস্য!

২৭ জুলাই

বি অফিসের অভিজ্ঞতা

১৭ জুলাই শনিবার আমরা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক নেটওয়ার্কের প্রতিনিধি হিসেবে ১২ জন শিক্ষক মিন্টো রোডের ডিবি অফিসে ই। আমরা গিয়েছিলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনজন ছাত্র নাহিদ ইসলাম, আসিফ মাহমুদ ও আবু বাকের মজুমদারের অবস্থা জানার জন্য, যাদের গতকাল হাসপাতাল থেকে চিকিৎসারত অবস্থায় সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকের ইচ্ছার বিরুদ্ধে উঠিয়ে আনা য়ছে। আমরা যেহেতু তাদের শিক্ষক, স্বাভাবিকভাবেই আমরা এই শিক্ষার্থীদের নিয়ে উদ্বিগ্ন। তারা কোথায় আছে, কেমন আছে তা জানাটাই ছিলো আমাদের মূল উদ্দেশ্য।

ন্তু আমাদের ১২ জন শিক্ষকের কাউকেই ডিবি অফিসের ভেতরে ঢুকতে দেওয়া হয় নাই। রিসিপশন থেকে আমাদের নানো হয় যে এ বিষয়ে কথা বলতে গেলে ডিবি প্রধান মোহাম্মদ হারুন অর রশীদের সাথে কথা বলতে হবে এবং শুধুমাত্র র অনুমতি পেলেই আমরা ভেতরে যেতে পারব। আমাদের এও জানানো হয় যে ডিবি প্রধান অনেকক্ষণ থাকবেন, তাই কোনো তাড়া নেই। বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করবার পর ডিবি প্রধানের অফিস থেকে আমাদের জানানো হয় তিনি আজ আমাদের সাথে কথা বলতে পারবেন না কারণ তিনি এখন বের হয়ে যাচ্ছেন।

ডিবি প্রধান আমাদের সাথে কথা বলবেন না এটা জানার পর আমরা অন্য কোনো অফিসারের সাথে কথা বলার চেষ্টা করি। তারা বলেন কথা বলার সেরকম আর কেউ নেই, কথা বলতে গেলে তার সাথেই কথা বলতে হবে। এরকম একটা গুরুত্বপূর্ণ অফিসে জরুরি বিষয়ে আলাপ করার জন্য দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তি থাকবে না এটা আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হয়নি। এর কিছুক্ষণ পরেই ডিবি অফিসের প্রধান ফটকের পাশে দায়িত্বরত পুলিশ সদস্য মারফৎ আমরা জানতে পারি ডিবি প্রধান গাড়ি নিয়ে আমাদের সামনে দিয়েই বের হয়ে গেছেন।

আমরা ১২ জন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ডিবি প্রধানের সাথে আজকে কোনো সামাজিক দেখা-সাক্ষাৎ করতে যাই নাই। গিয়েছিলাম একটি জরুরি এবং গুরুতর প্রয়োজনে। আমাদের সাথে সাক্ষাৎ না করাটা তাঁর দায়িত্বের গুরুতর অবহেলা বলে আমরা মনে করি। সেই সাথে তাঁর এই আচরণ অত্যন্ত অসৌজন্যমূলক এবং অপমানজনকও মনে করি।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে ডিবি প্রধান সাংবাদিক সম্মেলনে আজকেই এই তিনজন ছাত্রকে ধরে আনার কারণ উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন যে এই তিনজন ছাত্র নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। তাঁদের নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য ডিবি অফিসে নিয়ে আসা হয়েছে। আমরা এর আগে কখনো শুনিনি যে হাসপাতাল থেকে উঠিয়ে আহত কাউকে নিরাপত্তা দেয়ার জন্য ইচ্ছার বিরুদ্ধে ধরে এনে ডিবি অফিসে রাখা হয়। পত্র-পত্রিকার বর্ণনা অনুযায়ী এই ছাত্রদের নিরাপত্তার নামে জোর করে নিয়ে আসার সময় পোশাক পরিবর্তন করারও সময় দেওয়া হয় নাই। সেই সময় ছাত্ররা ভয়ে থরথর করে কাঁপছিলো।

পুরো বিষয়টি কোন ধরনের নিরাপত্তা দেয়ার জন্য করা হচ্ছে তা সহজেই অনুমেয়। তার উপরে তিনজনের মধ্যে দু'জন ছাত্র, নাহিদ এবং আসিফকে কিছুদিন আগেও ধরে নিয়ে গিয়ে অমানুষিক নির্যাতন করা হয়েছে, ইঞ্জেকশন দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছে বলে পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। এখন হাসপাতালে চিকিৎসারত অবস্থা থেকে দ্বিতীয়বার ধরে নিয়ে গেলে তাঁদের প্রাণশংকা হওয়াটা অস্বাভাবিক নয়।

বি বা আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর এ ধরনের বল প্রয়োগের তৎপরতা সামগ্রিকভাবেই জনমনে ভীতি সঞ্চার করছে। যা সুষ্ঠু ও স্বাভাবিক পরিস্থিতি সৃষ্টির অন্তরায় বলে আমরা মনে করি।

লিশ বা নিরাপত্তা বাহিনীকে আমরা জনগণের সেবক হিসেবে দেখতে চাই। কোনো নির্যাতনের হাতিয়ার নয়। তাই আমাদের বী অবিলম্বে এই তিনজন ছাত্রকে নিরাপত্তা দেয়ার প্রহসন বন্ধ করে তাঁদের পরিবারের কাছে অথবা তাঁদের নিজেদের দ্ধান্ত অনুযায়ী নিরাপদ স্থানে যেতে দেওয়া হোক।

জুলাই

সদস্যের বিরুদ্ধে হত্যাচেষ্টার সংশ্লিষ্টতা স্থাপনের জন্য দয়েরকৃত জিডি প্রসঙ্গে

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন অধ্যয়ন বিভাগের শিক্ষক সোনম সাহা একই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক গীতি আরা নাসরীন ও সামিনা লুৎফা এবং নাট্যকর্মী ফেরদৌস আরা রুমীর বিরুদ্ধে শাহবাগ থানায় যে সাধারণ ডায়রি করেছেন তা জেনে আমরা বিস্মিত হয়েছি। আমরা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক নেটওয়ার্কের সক্রিয় সদস্য গীতি আরা নাসরীন ও সামিনা লুৎফার বিরুদ্ধে প্রণীত এই সাধারণ ডায়রি দায়েরের ঘটনার নিন্দা জানাই।

জিডিতে বলা হয়েছে, ২৪শে জুলাই ২০২৪ তারিখে কে বা কারা অভিযোগকারী সোনম সাহাকে পথ রুদ্ধ করে প্রাণনাশের হুমকি দিয়েছে এবং এজন্য অনুমানের ভিত্তিতে, অভিযুক্ত তিনজনের ফেসবুক পোস্টকে কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। আমরা মনে করি ২৪শে জুলাইয়ের কথিত হুমকির সাথে গীতি আরা নাসরীন ও সামিনা লুৎফার সংশ্লিষ্টতা স্থাপনের চেষ্টা নেটওয়ার্কের সাম্প্রতিক অবস্থানে তাদের সক্রিয়তাকে প্রশ্নবিদ্ধ করার ষড়যন্ত্রের অংশ।

কোটা সংস্কার আন্দোলনকে ঘিরে যে হত্যাকাণ্ড, সহিংসতা ও নাশকতার ঘটনা ঘটেছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে, যখন আন্দোলনকারীদের বেআইনীভাবে ব্যাপক ধরপাকড় ও অপহরণ করা হচ্ছে, তখন এধরনের বিষয়কে আমরা বিচ্ছিন্নভাবে দেখছি না। সাধারণত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এধরনের অভিযোগ করা হলে, থানা থেকে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা হয়, এক্ষেত্রে সেরকম ঘটে থাকলে, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অন্য সহকর্মীদের বিরুদ্ধে থানা-পুলিশ করতে সোনম সাহাকে নিবৃত না করতে পারাকে কর্তৃপক্ষের ব্যর্থতা হিসেবে আমরা উল্লেখ করতে চাই। চলমান দমনপীড়নের মধ্যে, সরকারের দায়িত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের উক্তিতে 'সবার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবার' যে ঘোষণা শোনা যাচ্ছে, যার মধ্যে ছাত্র-জনতার পাশে দাঁড়ানো শিক্ষকরাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন, তার সঙ্গে এই ঘটনার যোগসাজস থাকতে পারে বলে আমাদের কাছে প্রতীয়মান হয়। আমাদের সন্দেহ, ২৪শে জুলাই যে অভিযোগ করা হয়েছে, তা ২৮ জুলাইয়ে একটি-দু'টি সংবাদমাধ্যমে প্রকাশ করার মধ্য দিয়ে জাতির কাছে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক নেটওয়ার্কের গ্রহণযোগ্যতাকে হেয় প্রতিপন্ন করার ক্ষেত্র প্রস্তুত করা হচ্ছে। আমরা এহেন হীন প্রচেষ্টাকে ধিক্কার জানাই।

আমরা আশা করবো, সোনম সাহা তার অভিযোগ থেকে অভিযুক্ত তিনজনের নাম প্রত্যাহার করে, বিচক্ষণতার পরিচয় দেবেন।

২৯ জুলাই

ত্র হত্যা, নির্বিচার গ্রেফতার বন্ধ, সমন্বয়কদের মুক্তি এবং নেটওয়ার্ক সদস্যদের বিরুদ্ধে হয়রানির বিরুদ্ধে অপরাজেয় ...লার পাদদেশে সমাবেশ করে বিশ্ববিদ্যালয়য় শিক্ষক নেটওয়ার্ক।

৩১ জুলাই

পুলিশী হয়রানির নিন্দা ও কর্মসূচি ঘোষণা

আজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে লোক প্রশাসন বিভাগের অধ্যাপক ড. নুসরাত জাহান চৌধুরী এবং একই বিভাগের প্রভাষক শেহরীন আমিন ভূঁইয়ার সাথে পুলিশের অসদাচারণ এবং হামলার তীব্র নিন্দা জানাচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক নেটওয়ার্ক। একই সাথে এই ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত করে আইনানুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে দাবি জানাচ্ছে।

বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসগুলোতে জুলাই হত্যাকাণ্ডের বিচারের দাবীতে আন্দোলনরত শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের ওপর হামলার এই ঘটনা অত্যন্ত ন্যাক্কারজনক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসনের প্রতি এক চরম আঘাত। আমরা বারবার দেখছি, বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন ও স্বাধীন মতপ্রকাশের অধিকারের তোয়াক্কা সরকার ও তার আইনশৃঙ্খলা বাহিনীগুলো মোটেও করছে না। তাদের বর্বরোচিত জুলাই হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে সারা দেশ যখন ক্ষোভে উত্তাল, তখন সেই ক্ষোভ প্রশমনে সরকার বাহিনীগুলোর মাধ্যমে দমন- পীড়ন, ব্লকরেইড, বাসাবাড়ি থেকে শিক্ষার্থীদের বেনামে উঠিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা চলাকালে শিক্ষার্থীদের রক্ষায় শিক্ষকরা এগিয়ে এলে তাদের ওপরেও হামলা করা হয়েছে।

কর্মসূচি ঘোষণা

এই হত্যাকাণ্ডের বিচার, শিক্ষার্থীদের ওপর দমন-পীড়ন ও শিক্ষকদের ওপর হামলা ও পাবলিক-প্রাইভেট সব বিশ্ববিদ্যালয়ের

শিক্ষক-শিক্ষার্থীর স্বাধীন মতপ্রকাশের অধিকার দমিয়ে রাখার প্রতিবাদে ১ আগস্ট সকাল ১১ টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে নিপীড়নবিরোধী শিক্ষক সমাবেশের আয়োজন করেছে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক নেটওয়ার্ক।

এছাড়া, গণগ্রেফতার বন্ধ, জুলাই হত্যাকাণ্ডের বিচার, আটক শিক্ষার্থী-জনতার মুক্তি, কারফিউ প্রত্যাহার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুলে দেওয়া ও অসংখ্য শিক্ষার্থী-জনতাকে হত্যার দায়ে হাসিনা সরকারের পদত্যাগ দাবিতে আগামী ২ আগস্ট বিকাল ৩টায় জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে শিক্ষার্থী-জনতার দ্রোহযাত্রার আহ্বান করা হয়েছে। উক্ত সমাবেশে সভাপতিত্ব করবেন অধ্যাপক নু মুহাম্মদ। উপস্থিত থাকবেন শিক্ষার্থী, শিক্ষক, শ্রমিক, সাংস্কৃতিক কর্মী, চিকিৎসক, আইনজীবী, প্রকৌশলী, বুদ্ধিজীবীসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ। এই প্রতিবাদী আয়োজনে সংহতি জ্ঞাপন করে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক নেটওয়ার্কের শিক্ষকবৃন্দও শগ্রহণ করবেন।

শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের ওপর পুলিশি হামলার নিন্দা, প্রতিবাদ ও দোষীদের বিচারের দাবিতে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক নেটওয়ার্কের ক্ষ বিজ্ঞপ্তিটি প্রচারিত হলো।

আগস্ট

নিপীড়নবিরোধী শিক্ষক সমাবেশ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে সাথে একই দিনে রাজশাহী, কুমিল্লা, ঢাকার ইনডিপেনডেন্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকদের আয়োজনে সমাবেশ, মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। রাজশাহী, চট্টগ্রামসহ অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা ঘন্টার পর ঘন্টা বসে থেকে তাদের শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন থানা থেকে ছাড়িয়ে আনেন। এদিন ঢাকার সমাবেশের কাছাকাছি সময়ে অর্থনীতি বিভাগ ও উন্নয়ন অধ্যয়ন বিভাগের শিক্ষকরাও সরকারি আক্রমনের বিরুদ্ধে সমাবেশ করেছিলেন। এদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশ পথে বিভিন্ন শিক্ষকদের আটকে দেওয়া হয়। আটক সমাবেশকারীদের নিয়ে নেটওয়ার্কের সমাবেশটি একটি মিছিল নিয়ে রাজু ভাস্কর্য হয়ে কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে যায় সেখানে পুস্প স্তবক অর্পন করা হয়। সেখানে জানা যায় যে ডিবি অফিসে ৬ সমন্বয়ক অনশনে। সেখান থেকে শিক্ষকরা আবার ডিবি অফিসে যান।

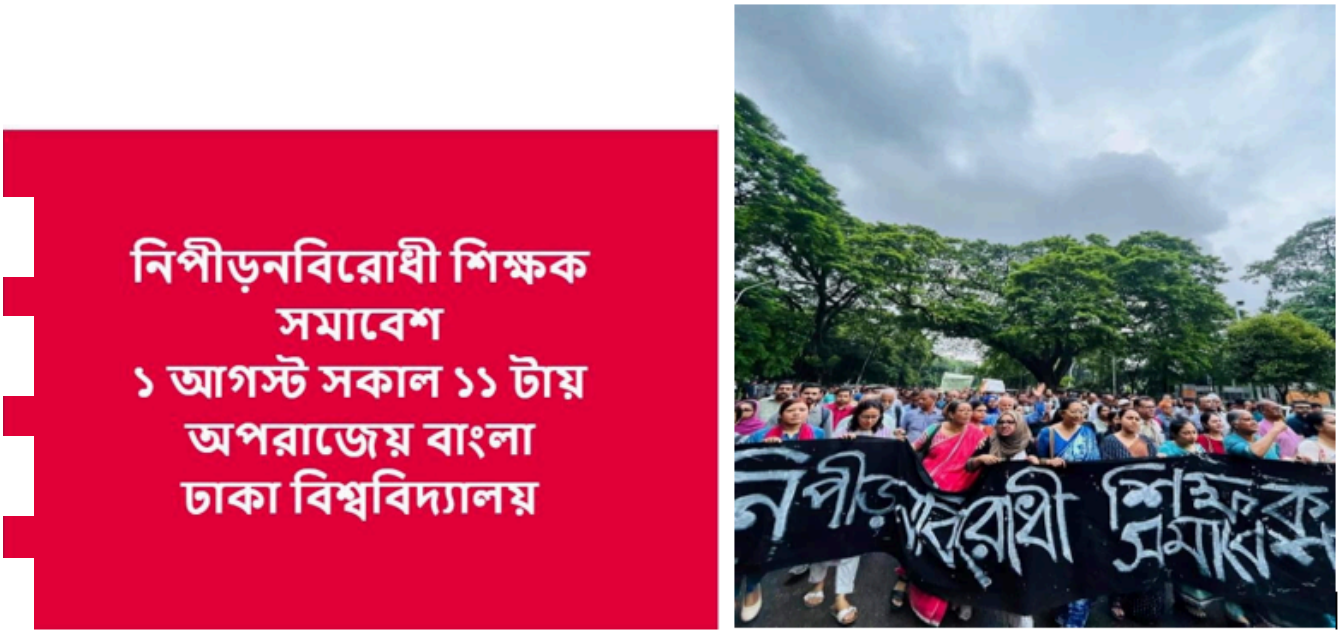

২ আগস্ট

দ্রোহযাত্রা

এই যাত্রা আয়োজনে নেটওয়ার্কের শিক্ষকদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। মূল ভাষণ দেন অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ যেখানে তিনি সরাসরি এক দফা উত্থাপন করেন: শেখ হাসিনার পদত্যাগ! হাজার হাজার মানুষের এই দ্রোহযাত্রা শেষ হয় কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে। শহিদ মিনারে মানূষের ঢল দেখেই নেটওয়ার্কের শিক্ষকরা উপলব্ধি করেন যে এখন শেখ হাসিনার পদত্যাগের উপায়টা চূড়ান্ত করতে হবে। তখন থেকেই রূপান্তরের রূপরেখা তৈরির কাজ শুরু হয়।

৪ আগস্ট

গণতান্ত্রিক রূপান্তরের রূপরেখা প্রস্তাব

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক নেটওয়ার্কের লিখিত বক্তব্যের সারসংক্ষেপ

১। অবিলম্বে শিক্ষার্থী-জনতার অভ্যুত্থানের মূল শক্তিগুলির সম্মতিক্রমে, নাগরিক ও রাজনৈতিক শক্তিসমূহের মতামতের ভিত্তিতে শিক্ষক, বিচারপতি, আইনজীবী ও নাগরিক সমাজের অংশীজনদের নিয়ে একটি জাতি-ধর্ম-লিঙ্গ-শ্রেণীর অন্তর্ভুক্তিমূলক অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করা হবে। এই সরকারের সদস্য নির্বাচনে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা মুখ্য ভূমিকা পালন করবে। এই সরকারের কাছে শেখ হাসিনা সরকার পদত্যাগ করবে।

২। শিক্ষার্থী-জনতার অভ্যুত্থানের মূল শক্তিগুলির অংশীজনদের প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠনসমূহের সমন্বয়ে সর্বদলীয় শিক্ষার্থী-শিক্ষকসহ নাগরিকদের নেতৃত্বে একটি ছায়া সরকার গঠিত হবে। তারা এই অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের জবাবদিহিতা এবং স্বচ্ছতা নিশ্চিত করবে যাতে দেশে একটি গণতান্ত্রিক নির্বাচনের উপযুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত হয়, এবং যাতে এই গণঅভ্যুত্থানের প্রকৃত দাবী 'বৈষম্যহীন বাংলাদেশ' প্রতিষ্ঠার পথে যথেষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। এ ধরনের ছায়া সরকার নির্বাচিত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায়ও অব্যাহত থাকতে পারে।

৩। অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর যে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বগুলো পালন করবে সেগুলো হলো:

ক. জুলাই হত্যাকাণ্ড এবং জনগণের ওপর নৃশংস জোরজুলুমের জন্য দায়ী ব্যক্তিদের বিচারের জন্য জাতিসংঘের সহযোগিতায় তদন্ত কমিটি গঠন করবে এবং বিচারের জন্য বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠন করবে।

খ. সাম্প্রতিক সময়ে করা মিথ্যা ও হয়রানিমূলক মামলা বাতিল করবে এবং এসব মামলায় আটক সবাইকে মুক্তি দিবে।

সরকার গঠনের ৬ মাসের মধ্যে একটি সংবিধান সভা (কন্সটিটিউশনাল এসেম্বলি) গঠনের জন্য নির্বাচনের ব্যবস্থা করবে। নির্বাচিত সংবিধান সভা এমন এক গণতান্ত্রিক সংবিধান প্রস্তাব করবে যে সংবিধানে স্বৈরতান্ত্রিক, সাম্প্রদায়িক, জনবিদ্বেষী, বৈষম্যমূলক কোনো ধারা থাকবে না। সেই সংবিধানের ভিত্তিতে সরকার অবিলম্বে পরবর্তী সাধারণ নির্বাচন আয়োজন করবে।

৪। শিক্ষার্থী-নাগরিকদের অভ্যুত্থানের মূল শক্তিগুলির মধ্যে সংলাপের ভিত্তিতে একটি ঘোষণাপত্র চূড়ান্ত করতে হবে যেখানে বৈচিত্র্য ও ভিন্নতার মেলবন্ধনে সকল জনগণের বাংলাদেশের অগ্রযাত্রার পথনির্দেশ করা হবে।

আমাদের প্রস্তাবিত অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন, মূল অংশীজনের তালিকা প্রণয়ণ এবং শিক্ষার্থী জনতার ছায়া সরকার গঠনের প্রয়োজনে যোগাযোগের ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক নেটওয়ার্ক যেকোনো দায়িত্ব পালন করতে প্রস্তুত। এ রূপরেখা একটি প্রাথমিক প্রস্তাব মাত্র, প্রয়োজনে এ প্রস্তাবকে আরো বিস্তৃত করার জন্য আমরা ভবিষ্যতে কাজ করতে আগ্রহী।

(সংবাদ সম্মেলন। রিপোর্টার্স ইউনিটি, সকাল ১১টা)

৫ আগস্ট

শিক্ষার্থী-জনতার অভ্যুত্থানের বিজয় ও শান্তি-শৃংখলা রক্ষার আহবান

গণতন্ত্রের এই বিজয় মুহূর্তে সকল নাগরিককে অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং একই সাথে জুলাই হত্যাকান্ডে নিহত শহীদদের স্মরণ করছি। সম্পূর্ণ বিজয় এখনো অর্জিত হয় নাই। এই সংবেদনশীল মুহূর্তে প্রত্যেকটি নাগরিকের কাছে আমাদের অনুরোধ আপনারা দয়া করে শান্তি বজায় রাখুন।

আমাদের জাতীয় সম্পদ গণভবন, সংসদ ভবন ইত্যাদি সহ যেকোনো ধ্বংস ভাংচুর অগ্নি সংযোগ লুটতরাজ কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। বাংলাদেশ ধর্ম বর্ণ লিংগ নির্বিশেষে সবার। ভিন্ন ধর্মের ভিন্ন মতাদর্শের ভিন্ন পরিচয়ের সকলের সুরক্ষার দায়িত্ব আমার আপনার সকলের।

এই অর্থহীন হিংসা বিদ্বেষ অনেক ত্যাগের বিনিময়ে পাওয়া আমাদের এই অর্জনকে প্রশ্নবিদ্ধ করবে। তাই আমরা অনুরোধ করছি সবাই শান্তি বজায় রাখুন অহেতুক ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকুন।

[৫ আগস্ট অপরাহ্নে মধুর ক্যান্টিনে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে পঠিত লিখিত বক্তব্য]

৭ আগস্ট

সাম্য সুরক্ষা ও ন্যায়বিচার সবার জন্য:

সাম্প্রদায়িক হামলাসহ সকল সহিংসতা রুখে দাঁড়ান

একটি চরম নিপীড়নমূলক ও ফ্যাসিস্ট সরকারের বিরুদ্ধে সরকারি চাকরীর কোটা সংস্কারের দাবী নিয়ে জুলাই মাসের প্রথম থেকে বাংলাদেশের শিক্ষার্থীবৃন্দ জন আন্দোলন শুরু করে। বৈষম্যের পরিবর্তে সাম্যের দাবি তোলায় তাদেরকে শিকার হতে হয় নির্মম জুলাই হত্যাকাণ্ডের। সরকারি হিসাবে ৩০০ জনের বেশি, এবং বেসরকারি হিসেবে এক হাজারেরও বেশি শিক্ষার্থী, শু থেকে বৃদ্ধ, পুরুষ ও নারী এবং সকল শ্রেণি-পেশার নাগরিক আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এবং আওয়ামী লীগের অঙ্গসংগঠনগুলোর গুন্ডাদের হাতে নৃশংস ও নারকীয় হত্যাকান্ডের শিকার হন। ক্রমবর্ধমান নিপীড়ন-নির্যাতন-খুনের মুখে আর রশাসক শেখ হাসিনা ও অনুসারীদের হিংস্র গোয়ার্তুমি আর প্রতিশোধপরায়নতা আর অব্যাহত হামলার প্রতিক্রিয়ায় শিক্ষার্থী আন্দোলন একটি গণঅভ্যুত্থানে রূপান্তরিত হয়। পরিণামে শিক্ষার্থী-নাগরিকদের অবিস্মরণীয় বিদ্রোহের মুখে গতকাল জুলাই-্যাকাণ্ডের মূল নির্দেশদাতা, ফ্যাসিস্ট এবং স্বৈরশাসক শেখ হাসিনা পদত্যাগ করে দেশ ছেড়ে পালাতে বাধ্য হন। দীর্ঘ ও ভয়াবহ নিপীড়নমূলক স্বৈরশাসন থেকে এই মুক্তি অর্জনের জন্য তাই বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক নেটওয়ার্ক (বিশিনেট) বাংলাদেশের ক্ষার্থীসহ আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত সকল মুক্তিকামী জনতাকে উষ্ণ অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছে।

তবে আমরা মনে করি, একটি নিপীড়নমূলক ফ্যাসিস্ট শাসন থেকে এই মুক্তি অর্জনের পর রাষ্ট্রকে মেরামত করে একটি াতান্ত্রিক, বহুত্ববাদী, অসাম্প্রদায়িক, সাম্য ও ন্যায়বিচার নিশ্চিতকারী রাষ্ট্রে রূপান্তরের কঠিন পথ আমাদের সামনে। মুক্তি এখনও অর্জিত হয়নি। ১৯ জুলাইয়ের হত্যাকাণ্ডের পর তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার সন্ধ্যা থেকে বেসামরিক প্রশাসনকে সহায়তার শর্তে (In aid to civil power) পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সেনাবাহিনীকে মাঠে মোতায়েন করে। তারপরও পরিস্থিতির ক্রমাবনতি হতে থাকে এবং গত রবিবার (৪ঠা আগস্ট) সারাদেশে সর্বোচ্চ সংখ্যক (সরকারি হিসাবে ১০২ জনের বেশি) মানুষ নিহত হন। অনির্দিষ্টকালের কারফিউ জারি এবং তিন দিনের জন্য সাধারণ ছুটি ঘোষণা করা হয়। যদিও আন্দোলনরত শিক্ষার্থীবৃন্দ সরকারের এই ঘোষণা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করে ৫ আগস্ট ঢাকা মার্চ-এর ডাক দেয়। লক্ষ লক্ষ শিক্ষার্থী ও নাগরিকের সমাবেশ ও বিদ্রোহের মুখে গতকাল প্রধানমন্ত্রী জাতীয় সংসদের স্পীকারের কাছে পদত্যাগপত্র জমা দেন এবং বিদেশে পালিয়ে যান।

উল্লেখ্য যে দুপুরে প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগপত্র জমা দিয়ে বিদেশে পালানোর পর আমরা দেখতে পাই সেনাবাহিনী প্রধান জনগণের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিয়ে একটি অন্তর্বর্তী সরকার গঠন হবে বলে জানান। এরপর আমরা দেখতে পাই যে, সেনাপ্রধান বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতি এবং বিভিন্ন দলের প্রতিনিধির সাথে সভায় বসেন। কিন্তু এই সংকটময় মুহূর্তে আমরা বিস্মিত হয়ে ঢাকা শহরসহ সারাদেশে পুলিশ ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর অনুপস্থিতি আর চেইন অব কমান্ডের পুরাপুরি অনুপস্থিতি লক্ষ্য করি। বিভিন্ন অঞ্চলে ও রাজধানীতে মোতায়েন সেনাসদস্যগণেরও নিষ্ক্রিয়তা লক্ষ্যণীয়ভাবে আমাদের নজরে পড়ে। বাস্তবে সেনাপ্রধানকে টেলিভিশনে দেখাচ্ছিল অপ্রস্তুত; যেন এক জাহাজচালক যিনি তাঁর নাবিকদের চেনেন না। কেন? এই কয়দিনের ঘটনাবলীর কোনো পাঠ তাঁদের ছিল না? কোনো পরিণতি তাঁরা আগাম-আন্দাজ করতে পারেন নাই? এতগুলো গোয়েন্দাসংস্থা তাহলে খামোকা আছে? আর যদি কোনো রিডিং থেকে থাকে, তাহলে শেখ হাসিনার পরিণতির পর কীভাবে শৃঙ্খলা রক্ষা হবে তার একটা আউটলেট তাঁরা তৈরি করেননি কেন? পরিস্থিতিতে আমাদের এও মনে হয়েছে যে বাংলাদেশের পুলিশ বাহিনীকে সেনাবাহিনী ডাম্প করেছে। 'ওয়ার-ক্যাজুয়ালটির'র মতো তাঁদেরকে ক্রুদ্ধ জনতার সামনে অরক্ষিত রেখেছে। জানমালের হেফজতের যে ওয়াদা সেনাপ্রধান করেছেন, তার জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি যে তাদের নেই তা খুবই স্পষ্ট। আমরা সেনাবাহিনীকে ক্ষয়ক্ষতি বাড়ার আগেই পেশাগত কর্তব্য পালনের আহ্বান জানাই।

অথচ শাসন ও শাসক বদলের ক্রান্তিকালে ভয়াবহ নৈরাজ্য ও অরাজকতা সৃষ্ট হওয়ার আশঙ্কা সবসময়ই থাকে। প্রশাসনিক অস্পষ্টতা, শূন্যতা এবং সিদ্ধান্তহীতার সুযোগে দুষ্কৃতিকারীরা ঢাকাসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে অগ্নিসংযোগ, ভাংচুর, লুটতরাজ চালানো শুরু করে। রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন স্থাপনা ভাঙ্গচুর, লুটপাট, থানা জ্বালিয়ে দেয়া, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতা চত্বরের এবং বিখ্যাত ঐতিহ্য ময়মনসিংহের শশীলজ সহ নির্বিচার ভাংচুর, ভিন্ন মতাবলম্বীদের উপরে হামলা, তাদের সম্পত্তি লুটপাট ও পোড়ানো শুরু হয়। একইসঙ্গে সন্ধ্যা থেকে খবর আসতে থাকে যে কিছু স্থানে ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু ও দের বাসাবাড়িতে, ধর্মস্থানের উপর হামলা লুটপাট অব্যহত রয়েছে। সংবাদমাধ্যমের দপ্তরে ও মিডিয়া কর্মীদের উপরে হামলা হয়েছে। এসব বহু হামলার খবর মিডিয়ায় পরিবেশিত হয় নাই এখনো। থানায় থানায় ক্ষিপ্ত জনতা পুলিশের উপর, নীয় আওয়ামী লীগের উপর হামলা করছে।

্যরাত অব্দি আমরা জানি যে সারাদেশে পুলিশের অনুপস্থিতি ছিলো, এবং সেনাবাহিনী টহলও নির্দিষ্ট কিছু সংখ্যক এলাকায় সীমাবদ্ধ ছিলো। এছাড়াও গতকাল দেশের বেশ কিছু স্থানে পুলিশ গুলি করে সাধারণ মানুষকে হত্যা করেছে। এমতাবস্থায় বাংলাদেশের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টের ঘোরতর আশংকা করছি আমরা। পুলিশের অনুপস্থিতিতে সেনাবাহিনী নাগরিকদের সুরক্ষায় এগিয়ে না এলে, বাংলাদেশের শিক্ষার্থীদের এই গণঅভ্যুত্থান নস্যাৎ হয়ে যেতে পারে। সাময়িক বিজয় গণতান্ত্রিক রূপান্তরের চূড়ান্ত পর্যায়ে না গিয়ে, একটি পাল্টা অভ্যুত্থানের মাধ্যমে সুবিধাবাদী, মতলববাজ, অগণতান্ত্রিক ও স্বৈরাচারী শক্তির কাছে রাষ্ট্রের ক্ষমতা আবার কুক্ষিগত হয়ে যেতে পারে।

আমরা চাই অতি দ্রুত একটি সুস্থ সভ্য গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা দেশে চালু হবে। আমরা একটি অসাম্প্রদায়িক বৈষম্যহীন বাংলাদেশ দেখতে চাই যেখানে সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার হবে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি। যে কোন ধরনের সন্ত্রাস একযোগে রুখে দিতেও আমরা বদ্ধপরিকর। পারস্পরিক সৌহার্দ্য বজায় রাখা হবে আমাদের রাষ্ট্র পরিচালনার অন্যতম লক্ষ্য। তাই ছাত্র-জনতার এই অভূতপূর্ব ঐতিহাসিক গণ-অভ্যুত্থানকে কেউ কালিমালিপ্ত করতে না পারে সেদিকে কড়া নজর রাখতে হবে। উল্লাস-উচ্ছ্বাস যাতে কোনরকম প্রতিহিংসার জন্ম না দেয় সেদিকে দায়িত্বশীল নাগরিকদের সজাগ থাকতে হবে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে, আমরা আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীসহ বাংলাদেশের জনগণের কাছে নিম্নোক্ত বিষয় বা ঘটনাবলী সম্পর্কে উদ্বেগ পেশ করছি-

১। বাংলাদেশ বর্তমানে কার শাসনে কোন বিধি অনুসারে চলছে? সেনাপ্রধানের, নাকি প্রেসিডেন্টের, নাকি স্পীকারের তত্ত্বাবধানে মন্ত্রীসভার অধীনে? ছাত্ররা অসহযোগের ডাক দিয়েছে। তাহলে তাদেরকে বাদ দিয়ে আইএসপিআর কোন ক্ষমতাবলে সকল কিছু খোলার ডাক দিল?

২। গণভবন, বিভিন পুলিশ থানা সহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সরকারি স্থাপনা সুরক্ষায় পুলিশের উপস্থিতি নেই কেন? পুলিশের অবর্তমানে সেনাবাহিনী সুরক্ষা প্রদানে ব্যর্থ হলো কেনো?

৩। কোন আইনের বলে, এবং কোন কোন মানদন্ডের আলোকে রাজনৈতিক নেতাদের বঙ্গভবনে সেনাবাহিনী প্রধানের সাথে দেখা করার জন্য মনোনীত বা নির্বাচিত করা হলো?

৪। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে সুরক্ষা প্রদানে এবং চলমান সকল ধরনের সহিংসতা বন্ধে কোন ধরনের দৃশ্যমান পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে না কেনো? এমন পদক্ষেপ এখন কে নিবে- রাষ্ট্রপতি নাকি সেনাবাহিনী?

৫। সেনাবাহিনীর কাজ হলো গণঅভ্যুত্থানকে নিরাপত্তা প্রদান করা এবং গণ অভ্যুত্থানকারীদের এখনকার কাজ হলো বাংলাদেশের জন্য একটি নতুন সংবিধান প্রণয়ন করা। এটা নিয়ে আলাপ না করে সেনাবাহিনী কর্তৃক বা সেনাবাহিনী সমর্থিত াকার সংক্রান্ত আলাপ জনপরিসরে উঠছে কেনো? কারা এই ধরনের আলাপ তুলছে?

সর্বোপরি, গণঅভ্যুত্থান সফল করা আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের সাথে সমাজের বিভিন্ন শ্রমজীবী ও পেশাজীবী শ্রেণী, . .ভিল প্রশাসন, এবং মিলিটারি প্রশাসনের সমন্বিত আলাপ ও আলোচনা শুরু না করে বঙ্গভবনে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ‘থে আলাপ করার মাধ্যমে জনগণকে কি বার্তা দেয়া হচ্ছে?

পরিশেষে এই গণআন্দোলনের জন্য যারা তাদের জীবন উৎসর্গ করেছেন সেসব শহীদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাই। অতি ত দেশের জনগণের সুরক্ষা এবং সহিংসতা বন্ধের জন্যও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানাই। এবং অবিলম্বে একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করে এর পরবর্তীতে একটি সংবিধান সভা গঠিত করে নতুন সংবিধান প্রণয়ন করে এর আলোকে কটি অবাধ নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক পন্থায় ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবী আমরা করছি।

[শাহবাগ থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতা চত্বর পর্যন্ত প্রতিবাদ মিছিল শেষে স্বাধীনতা চত্বরে অনুষ্ঠিত সাংবাদিক সম্মেলনে পঠিত লিখিত বক্তব্য]

১০ আগস্ট

অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে কী চাই?

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক নেটওয়ার্ক আয়োজিত মতবিনিময় সভা

জুলাই হত্যাকাণ্ড, শেখ হাসিনা সরকারের পদত্যাগ, সংসদ ভেঙ্গে দেওয়া ও অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের পর আমরা আজ এমন একটি পরিস্থিতির দ্বারপ্রান্তে এসে পৌছেছি যেখান থেকে সরকারের সামনের দিনের করণীয় নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। শুধু শিক্ষকরাই নন, সমাজের বিভিন্ন স্তর থেকে মানুষের প্রত্যাশা বেড়েছে নতুন সরকারের করণীয় নিয়ে।

শেখ হাসিনার পদত্যাগের আগেই বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক নেটওয়ার্ক দেশের গণতান্ত্রিক রূপান্তরের একটি রূপরেখা উপস্থাপন করেছিলো। পদত্যাগ কীভাবে হবে এবং নতুন সরকার কীভাবে গঠিত হবে এবং তার করণীয় কী – এই ছিল রূপরেখার সারবস্তু। এই রূপরেখা উপস্থাপনের মূল উদ্দেশ্য ছিল স্বৈরাচারীর পতনের দ্বারপ্রান্তে এসে বহু মানুষের প্রাণ ও ত্যাগের বিনিময়ে যেই অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন হবে তা যেন আবার একটি নতুন স্বৈরাচারী সরকার ক্ষমতায়নের ক্ষেত্র প্রস্তুত না করে তা নিশ্চিত করা। এই রূপরেখা নিয়ে নানা তর্ক-বিতর্ক হয়েছে যা আমাদের ইতিবাচক মনে হয়েছে। রূপরেখাটি খুবই সংক্ষিপ্ত ছিল কারণ আলোচনাসাপেক্ষে, তর্ক-বিতর্ক ও মত-বিনিময়ের মাধ্যমে এই রূপরেখাটিকে আমরা আরও সম্প্রসারণ

করতে চেয়েছি। আজকে আমরা আন্দোলনের বিভিন্ন অংশীজনের সাথে সরকারের করণীয় আলোচনার সূত্রপাত করতে যাচ্ছি।

সরকারের আশু করণীয়

জনগণের জান-মালের সুরক্ষায় অবিলম্বে আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীকে মাঠে নামতে হবে ও সকল জাতি-ধর্ম-বর্ণ-লিঙ্গ-শ্রেণি নির্বিশেষে সকলের জন্য সুরক্ষা ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে হবে।

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে ইতিবাচক পদক্ষেপ নিতে হবে। শিল্পস্থাপনা, উপাসনালয়, মাজার, ভাস্কর্যের উপর হামলা ঠেকাতে হবে ও হামলার বিচার করতে হবে।

৩। জুলাই হত্যাকাণ্ড এবং জনগণের ওপর নৃশংস জোর-জুলুমের জন্য দায়ী ব্যক্তিদের বিচারের জন্য জাতিসংঘের সহযোগিতায় তদন্ত কমিটি এবং বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠন করে দ্রুত তদন্ত ও বিচার কাজ শুরু করতে হবে।

৪। কোটা আন্দোলনে যারা আহত হয়ে কর্মক্ষমতা হারিয়েছেন, তাদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে ও আন্দোলনে নিহতদের পরিবারকে সাবলম্বী করার ব্যবস্থা নিতে হবে।

৪। সাম্প্রতিক সময়ে করা মিথ্যা, ষড়যন্ত্রমূলক ও হয়রানিমূলক মামলা বাতিল করতে হবে এবং এসব মামলায় আটক সবাইকে মুক্তি দিতে হবে।

৫। অর্থনীতির চাকা সচল করতে শিল্প-কলকারখানা খুলে দিয়ে সকলের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে।

দীর্ঘমেয়াদে সরকারের করণীয়

১। প্রথমেই দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় তারুণ্যের অংশগ্রহণের বিষয়টির দিকে। আপনারা লক্ষ্য করেছেন যে শুধু বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ, প্রতিরোধ, প্রাণ দিয়ে অধিকার আদায়ই নয়, সাবেক সরকারের পতনের পর আইনশৃঙ্খলা ভেঙ্গে পড়লে স্কুল কলেজের শিক্ষার্থী থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ নিজেরাই দলে দলে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ ও সহিংসতা দমনে সক্রিয় হয়ে উঠেছেন। অথচ তাদের জন্য নেই কিছু — পাড়ায় পাড়ায় খেলার মাঠ দখল করে ইমারত বানিয়েছেন ভূমি সন্ত্রাসীরা। ব্যায়ামাগার, মুক্ত উদ্যান, পাঠাগার নেই, শিশু পার্কটি বহু বছর ধরে বন্ধ রাখা হয়েছে।

- সরকারি উদ্যোগে বিভিন্ন এলাকায় নতুন করে কমিউনিটি সেন্টার চালু করতে হবে যেখানে মুক্তিযুদ্ধসহ মানুষের মুক্তি সংগ্রামের বিভিন্ন অধ্যায়সহ জুলাই হত্যাকাণ্ডে নিহত শহিদদের তালিকা, স্মৃতিস্তম্ভ, এবং ছবি থাকবে, শিল্প-সংস্কৃতির নানা শাখায় কাজ হবে। প্রতি বছর জুলাই মাসে যেন সারাদেশ জুড়ে তাদের স্মরণ করা যায় সেই ব্যবস্থা করতে হবে।

২। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ সংকট, খেলাপি ঋণ, পুনঃপুনঃ পানি ও বিদ্যুতের মতো অপরিহার্য জিনিসের দাম বৃদ্ধি জনজীবনকে অসহনীয় করে তুলেছে। এর পাশাপাশি স্বৈরাচারী সরকার থাকাকালীন আমাদের অধিকারের কথা বলতে গেলে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের অপব্যবহার করে মানুষকে অন্যায়ভাবে ভয়-ভীতির মধ্যে রাখা হয়েছে। গণমাধ্যমগুলোও

সরকারি বয়ান প্রচারে যত মনোযোগী হয়েছে তত মনোযোগী হয়নি মানুষের ভোগান্তি বা নিপীড়নের খবরগুলো প্রচার করতে। বাস্তবতাবর্জিত একটি উন্নয়নের ঘোরের মধ্যে মানুষকে থাকতে বাধ্য করা হয়েছে।

- গণমাধ্যমকে সরকারের এই প্রভাব থেকে মুক্ত করতে হবে। জনগণের মত প্রকাশের অধিকার নিশ্চিত করতে প্রথমেই সাইবার নিরাপত্তা আইন বাতিল করতে হবে। এই আইনে বা ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে আটক সকল নিরপরাধ ব্যক্তিকে মুক্তি দিতে হবে।

- আপনারা হয়তো লক্ষ করেছেন যে ৫ আগস্টের পর পুলিশের অনুপস্থিতিতে এবং চাঁদাবাজদের উৎপাত সাময়িক বন্ধ ার সাথে সাথে সবজির দাম কমে গেছে। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে পুলিশ ও সরকার দলীয় চাঁদাবাজদের সিন্ডিকেট সক্রিয় ছিল। সরকার গঠনের সাথে সাথে যদি আরেকটি সিন্ডিকেট আবার সক্রিয় হয়ে ওঠে তা জনজীবনকে নতুন করে পর্যস্ত করবে।

  অবিলম্বে পণ্যের বাজারে সকল সিন্ডিকেট বিলুপ্ত করতে হবে।
- কৃষি খাতের বাজার ব্যবস্থাপনা পুনরুদ্ধার করতে হবে
  কৃষি খাতে জেনেটিক্যালি মডিফাইড বীজের যে কোম্পানিকেন্দ্রিক বাজার ব্যবস্থা তৈরি হচ্ছে তা রোধ করার উপায় সন্ধান করতে হবে।
- রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে স্থানীয় ও অপরাপর বীজ সংরক্ষণ ও বীজ গবেষণা করবে।
- নিরাপদ খাদ্যের সংস্থান করতে হবে সবার জন্য।

৪। গত সপ্তাহ জুড়ে আমরা দেখছি, যাদের জনগণকে নিরাপত্তা দেবার কথা সেই পুলিশ নিরাপত্তাহীন হয়ে পড়েছে, অন্যান্য বাহিনীতেও নেই কোনো জবাবদিহি। এতদিন ধরে দুর্নীতি ও জবাবদিহিতার অভাবে পুলিশের অতিরিক্ত ক্ষমতায়ন হয়েছে ফলে এদের বিরুদ্ধে প্রচুর ক্ষোভ জমা হয়েছে। বিদ্যমান পক্ষপাতদুষ্ট বিচার ব্যবস্থার উপর অনাস্থা সৃষ্টি হয়েছে। আবার সরকার পতনের পর সংখ্যালঘু হত্যা নিপীড়ন, ভাস্কর্য-জাদুঘর-মাজার আক্রমণ, শিল্পীর বাড়ি ভাঙচুর, চুরি, ডাকাতি, লুটপাট, অগ্নিসংযোগ, হত্যাসহ ভয়ংকর নির্যাতন হয়েছে যার নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা বাহিনীগুলো নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হয়েছে।

- পুর্ববর্তী ভুলগুলো সংশোধন করতে আমলাতন্ত্র সংস্কার করে জনবান্ধব প্রশাসনিক ব্যবস্থা সৃষ্টি করতে হবে। আজকের মতবিনিময়ের অন্যতম আলোচ্য বিষয় হতে পারে কীভাবে পুলিশ প্রশাসনের সংস্কার ও পুনর্গঠন করা যায়, এবং বিচার ব্যবস্থাকে নিরপেক্ষ করা যায়।
- জুলাই হত্যাকাণ্ডের বিচার করতে হলে যেই ট্রাইব্যুনাল গঠন করতে হবে তা যেন নিরপেক্ষ হয় তা নিশ্চিত করতে হবে এই সরকারকে।
- ডিজিএফআই, র‍্যাব, বিজিবি ইত্যাদি বাহিনী জনগণের জন্য হুমকি হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে যারা সাধারণ মানুষ এবং আদিবাসীদের উপর নানা অন্যায় অজুহাত দেখিয়ে নিপীড়ন, খুন অব্যাহত রেখেছে। জুলাই মাসে সাধারণের উপর এ নিপীড়ন সব সীমা ছাড়িয়ে গেছে। এগুলো কীভাবে প্রতিরোধ করা যায় তার দিকনির্দেশনা প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

৫। এই সঙ্কটময় মুহূর্তে প্রাথমিকভাবে কিছু করণীয় উত্থাপনই আজকের মতবিনিময় সভার উদ্দেশ্য। আমরা জানি নির্বাচিত সরকার গঠন ছাড়া কোনো নীতি-প্রণয়ন করার সাংবিধানিক অধিকার অন্তর্বর্তী সরকারের নেই। তবে সরকার একটি কাঠামো গঠন করে দিয়ে যেতে পারে যা নির্বাচিত সরকার অনুসরণ করতে পারে।

- এক্ষেত্রে প্রথমেই প্রশাসনিক কাঠামোকে এমনভাবে ঢেলে সাজাতে হবে যেন তার জবাবদিহি নিশ্চিত করা যায় এবং প্রশাসনে বিদ্যমান সিন্ডিকেট বিলুপ্ত হয়।
- প্রশাসনকে দলীয় রাজনীতির প্রভাবমুক্ত রাখতে হবে।
  যত দেশি-বিদেশি গোপন চুক্তি আছে, সেগুলো জনসম্মুখে প্রকাশ করতে হবে।
- দুর্নীতিদমন কমিশন পুনর্গঠন করতে হবে যেন দুর্নীতি দমনের কাজটি শুধু কতিপয় ব্যক্তিকে দায়বদ্ধ করার মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকে।
- একটি সেল গঠন করে প্রত্যেকটি প্রশাসনিক কাঠামোর ভেতরে দুর্নীতি চিহ্নিত করার একটি স্থায়ী প্রক্রিয়া আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।
- স্বৈরাচারী সরকারের সময় সংঘটিত দুর্নীতি ও লুটপাটের বিচার করতে হবে।
  পুরো প্রশাসনের ছায়া অন্তর্বর্তী সরকার, জেলা প্রশাসন, উপজেলা প্রশাসন ইত্যাদি গঠন করতে হবে যাতে সামাজিক জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা যায়।

৬। দশ বছর আগে পথচলার শুরু থেকেই নেটওয়ার্ক বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষা কেমন হবে তা নিয়ে নিজ নিজ ক্যাম্পাসে আলোচনা চালিয়ে গেছে আর জাতীয় ভাবে ২০১৯ সালে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে এক কনভেনশনের আয়োজন করেছিল।

- আমরা শিক্ষা নীতি নিয়ে নতুন একটি টাস্কফোর্স গঠন করার প্রস্তাব দিতে চাই, যার উদ্দেশ্য হবে পরিবর্তিত বাস্তবতায় বাংলাদেশের পটভূমিতে যথাযোগ্য ও বাস্তবায়নযোগ্য একটি নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্র প্রস্তুত করা।
- আজকে বিদ্যমান শিক্ষাক্রম বাতিল, পুনর্বিন্যাস এবং যুগোপযোগী করা নিয়ে আলোচনা করতে হবে।
- নতুন প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মানোন্নয়নে বিশেষ পরিকল্পনা গ্রহণ ও নতুন আর কোনও বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা বন্ধ করতে হবে।

৭। বাংলাদেশ স্বাস্থ্যখাত বহু সঙ্কটে নিমজ্জিত। একদিকে প্রত্যন্ত এলাকায় চিকিৎসা কেন্দ্র নেই অন্যদিকে যা আছে সেগুলোর সক্ষমতা কম, চিকিৎসার মান খারাপ বলে চিকিৎসার জন্য মানুষ শহরে অথবা বিদেশে যাচ্ছে। মানহীন চিকিৎসাও কিনতে হচ্ছে চড়া দামে।

- স্বাস্থ্যখাতেও একটি টাস্কফোর্স গঠন করে সর্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা বাস্তবায়নের রূপকল্প করতে হবে।

৮। প্রবাসীদের দেশে পাঠানো আয় আমাদের অর্থনীতির একটি মূল চালিকাশক্তি। বিদেশি মুদ্রা অর্জনের জন্য তাদের ঝুঁকির মধ্যে ফেলা, এবং তাদের জানমালের নিরাপত্তার দিকে নজর না দিয়ে শুধু রেমিট্যান্সের উপর গুরুত্ব দিয়ে প্রবাসীদের আমরা নানা ভাবে অসম্মানিত হতে দেখেছি।

- প্রবাসীদের কেবল বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের উৎস হিসাবে না দেখে তাদের প্রতি মানবিক আচরণ নিশ্চিত করার জন্য তাদের প্রাণ ও জীবনমানকে যথাযথ মূল্য দিয়ে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।
- সেগুলো কীভাবে সম্ভব হবে তা নিয়ে একটি টাস্কফোর্স গঠন করে বিদ্যমান কাঠামোর দুর্বলতা চিহ্নিত করে সংশোধন আনতে হবে।

উন্নয়নের নামে রামপাল, রূপপুর, বাঁশখালীসহ পরিবেশবিধ্বংসী ও জনস্বার্থবিরোধী নানান অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়েছে। মেগাপ্রকল্পের ব্যয়ের দিক থেকে বাংলাদেশ এখন শীর্ষে রয়েছে। দেশি বিদেশি স্বার্থান্বেষি মহলের সাথে আঁতাত র দেশবিরোধী ব্যয়বহুল উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। বিভিন্ন জেলায় জেলায় প্রান্তিক মানুষের ভূমি দখল করে, অথবা অল্প দামে কিনে নিয়ে শিল্প কারখানা ও প্রকল্প নির্মাণের নামে ফেলে রাখা হয়েছে। এছাড়া, গত এক দশকে অনেক ী জলাশয় বেদখল হয়েছে। অপরিকল্পিত শিল্পায়নের ফলে নদী দূষণ, এবং নদী শাসনের নামে নদী সংকুচিত করা য়েছে। বনরক্ষার নামে বনের আশেপাশে কল-কারখানা, হোটেল, রিসোর্ট বানানো হয়েছে। পাহাড়ে ভূমি দখল করে হাড়িদের বাসস্থান বসবাসঅযোগ্য করা হয়েছে।

- পাহাড়িদের তাদের জমি ফিরিয়ে দিতে এবং তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় কী করা যায় যেন ভবিষ্যতে এই ভূমিদখল বন্ধ হয় তা নিয়ে পাহাড়িদের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করতে হবে।
- সকল জাতীয় স্বার্থবিরোধী অসম প্রকল্প পুনর্মূল্যায়ন করতে হবে।

১০। দেশীয় শিল্প যেমন পাট, চিনি, সার, কাগজ, চামড়া বিকশিত হতে পারতো সেগুলোকে দুর্বল করে দিয়ে আমদানিকৃত কাঁচামাল নির্ভর শিল্পের দিকে অধিক মনোযোগ দেয়া হয়েছে।

- বাংলাদেশের শিল্প বিকাশ কেমন হবে, কোন শিল্পকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে, কোন শিল্প ভর্তুকি দেয়া হবে এই প্রশ্নগুলো জাতীয় স্বার্থ বিবেচনায় ঠিক করতে হবে।

১১। একদিকে আমরা দেখেছি খেলাপি ঋণ বেড়েছে, ব্যবসায়ী-আমলা-মন্ত্রীরা বিদেশে অর্থ পাচার করেছে, অন্যদিকে বাংলাদেশে বিনিয়োগ বাড়েনি; ১৫ বছরে পাচার হয়েছে প্রায় ১৫০ বিলিয়ন ডলার। মানুষের আমানতের অর্থ সঠিক খাতে খরচ না হবার কারণে দেশে চাকরির সুযোগ তৈরি হচ্ছে না।

- ব্যাংক থেকে ঋণগুলো কীসের ভিত্তিতে দেয়া হয়েছে, এবং তা কী কাজে লাগানো হচ্ছে – এ নিয়ে বিশদ অনুসন্ধান জরুরি। এর ভিত্তিতে দুর্বৃত্ত চক্রকে এবং নিয়মভঙ্গ করে নেয়া ঋণগ্রহীতাদের সামনে এনে উপযুক্ত বিচার করতে হবে।

১২। বিভিন্ন জাতি, ধর্ম, লিঙ্গ, পেশার মানুষ জনবৈচিত্র্য দিয়ে দেশকে সমৃদ্ধ করেছে। যেকোনো দেশের জন্য এই জনবৈচিত্র্য একটি দুর্লভ প্রাপ্তি। এই জনবৈচিত্র্যকে অবমূল্যায়ন করে, বিভিন্ন সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর অধিকার বঞ্চিত করে, নাগরিক সেবা থেকে বঞ্চিত করে এই দেশ নাগরিক পরিসরে একটি অসম ক্ষেত্র তৈরি করে রেখেছে। সংবিধানে স্বীকৃতি লাভ থেকে শুরু করে আইন প্রণয়ন ও রাজনৈতিক অংশগ্রহণে তারা নানা বাধার সম্মুখীন হচ্ছে প্রতিনিয়ত। আমরা এর পরিবর্তন চাই।

১৩। আমরা দেখতে পেয়েছি, বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ এই আন্দোলনে শামিল হয়েছেন, শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি এই আন্দোলনে প্রাণ হারিয়েছেন অসংখ্য শ্রমজীবী মানুষ। এই শ্রমজীবী মানুষের একটা বিরাট অংশ অনানুষ্ঠানিক খাতে কর্মরত।